খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ
RIGHT TO FOOD BANGLADESH

খাদ্য অপচয় রোধে রাষ্ট্রের ভূমিকা ও খাদ্য অধিকার

প্রেক্ষাপট

এক দশক ধরে গড়ে প্রায় ৬ শতাংশের উপরে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি অব্যাহত ছিল। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ছিল ৭ দশমিক ২ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের (২০১৭-১৮) জন্য জিডিপি প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা ৭ দশমিক ৪ শতাংশ নির্ধারণ করা হলেও তা ৭ দশমিক ৬৫ শতাংশ হতে পারে, যা এ-যাবৎকালের রেকর্ড। এছাড়া চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মাথাপিছু আয় হবে ১ হাজার ৭৫২ ডলার, যা গত ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ছিল ১ হাজার ৬১০ ডলার। সামগ্রিক উন্নয়নে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি কৃষি, শিল্প, সেবা ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত এবং প্রাইভেট সেক্টর, বেসরকারি উন্নয়ন সেক্টর ও সব শ্রেণীর পেশাজীবীসহ সর্বস্ড়রের সাধারণ মানুষের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশ নিম্নমধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করেছে। এজন্য বাংলাদেশ সরকার ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং অন্যান্য সকল কার্যক্রমের মাধ্যমে এসডিজির ১নং লক্ষ্য 'সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান' ও ২নং লক্ষ্য 'ক্ষুধামুক্তি'সহ সকল লক্ষ্য অর্জনে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আনন্দের সংবাদ, উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি (সিডিপি) এর মূল ৩টি শর্ত যথাক্রমে মাথাপিছু গড় আয়, মানব সম্পদ সূচক ও অর্থনৈতিক ঝুঁকি সূচক পূরণ করেছে বাংলাদেশ। এ প্রেক্ষিতে ১৭ মার্চ ২০১৮ জাতিসংঘ বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে প্রাথমিক স্বীকৃতি প্রদান করেছে।

গত কয়েক বছরে কিছু সফলতা অর্জন করলেও বেশকিছু ক্ষেত্রে আমাদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ (২০১৬) তথ্যানুসারে দেশে এখনো দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে ২৪ দশমিক ৩ শতাংশ মানুষ। যারা কিনা প্রয়োজনীয় কিলোক্যালরি পায় না। এর মধ্যে অতি দরিদ্র এখনো ১২ দশমিক ৯ শতাংশ। পাশাপাশি পুষ্টি উন্নয়নে বেশকিছু কর্মসূচি থাকলেও এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা এখনো গৃহীত হয়নি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্যমতে, পাঁচ বছর বয়সী তিনজন শিশুর মধ্যে একজন খর্বাকায়। এছাড়া ১৪ শতাংশ শিশু রোগাপাতলা (থিন), ৪৪ শতাংশ মহিলা রক্তশূন্যতায় ভুগছে। ৫০ শতাংশ শিশুমৃত্যুর জন্য দায়ী পুষ্টিহীনতা। বিশালসংখ্যক মানুষ অপুষ্টির শিকার হচ্ছে, পাশাপাশি প্রতি বছর অপুষ্টিতে মারা যাচ্ছে অর্ধ লক্ষাধিক শিশু। এখনো দেশে উলেণ্ঢখযোগ্য শিশু বিকলাঙ্গ। আয়োডিনের অভাবে ভুগছে এক-তৃতীয়াংশ শিশু। ৫১ শতাংশ শিশু অ্যানিমিয়ায় ভুগছে। মায়েদের ক্ষেত্রে এ হার ৪২ শতাংশ। পুষ্টিহীনতার এ ধরনের পরিস্থিতি উচ্চমাত্রার ঝুঁকি তৈরি করছে। এবং দেশও বিশ্বের ঝুঁকিপূর্ণ ৩৬টি দেশের তালিকা থেকে বের হতে পারছে না।

কৃষির সাম্প্রতিক চিত্র, খাদ্যের অপচয় এবং খাদ্য অধিকার

বাংলাদেশের ধারাবাহিক এ উন্নয়নে কৃষি নানা দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ খাত। খাদ্য জোগানের মাধ্যমে খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করা, কর্মসংস্থান, শিল্প উৎপাদনের কাঁচামালের উৎস ছাড়াও এর সঙ্গে জড়িত দেশের সার্বিক উন্নয়নের অনুষঙ্গ। বর্তমানে দেশের শ্রমশক্তির প্রায় ৪৭ শতাংশ নিয়োজিত রয়েছে এ খাতে। আবার মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রায় ১৮ শতাংশ আসছে কৃষি (শস্য, মৎস্য, প্রাণী ও বন) খাত থেকে। এর মধ্যে শস্য খাতে অবদান ১৩ শতাংশ। আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে দানাদার খাদ্যশস্য, বিশেষ করে চালে স্বয়ংসম্পূর্ণতার কাছাকাছি এসেছে। প্রক্রিয়াজাত কৃষি শিল্পের বাজারও সম্প্রসারণ হচ্ছে। বেশকিছু ঝুঁকি সত্ত্বেও কৃষি খাতে গত কয়েক দশকে নীরব বিপ্লব সাধিত হয়েছে। সময় এসেছে এ খাতে উৎপাদনের মাধ্যমে বিশ্বের নেতৃত্ব দেয়ার। কৃষিতে এত দিন ধান উৎপাদনে বিশ্বে চতুর্থ অবস্থান– এটাই ছিল অন্যতম স্বীকৃতি। কিন্তু এখন সাড়ে ১২ লাখ টন আম উৎপাদনের মাধ্যমে বিশ্বে নবম স্থান, প্রায় এক কোটি টন আলু উৎপাদনের মাধ্যমে সপ্তম, সবজি উৎপাদনের প্রবৃদ্ধিতে তৃতীয়, মাছ উৎপাদনে চতুর্থ অবস্থান বাংলাদেশকে সুনাম এনে দিয়েছে। বাংলাদেশের ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট বা কালো ছাগলের চামড়া অনেক আগেই বিশ্বজয় করেছে। ছাগল উৎপাদনেও চতুর্থ স্থানের অধিকারী বাংলাদেশ। পাট খাতের অর্জনও কম নয়। বিশ্বে পাট উৎপাদনে দ্বিতীয় হলেও রফতানিতে বাংলাদেশ এখনো শীর্ষে।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে কৃষির এ অর্জনে সাফল্য আসছে ক্ষুদ্র আয়তনের জমি, উন্নত বীজ ও উপকরণ এবং প্রযুক্তির অভাবকে মোকাবেলা করেই। পাশাপাশি রয়েছে কৃষকের জ্ঞানের স্বল্পতা আর জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিও। পাশাপাশি ঘাতসহিষ্ণু (তাপ, লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা, খরা) জাতের অভাব, অপরিকল্পিত নগরায়ণ ও শিল্পায়নের মাধ্যমে কৃষিজমি কমে যাওয়া তো আছেই। কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে না পারা ছাড়াও অনুন্নত বাজার ও প্রক্রিয়াজাত শিল্প বিকাশ না হওয়াটাও অন্যতম বাধা। তাছাড়া কৃষির নতুন চ্যালেঞ্জ এখন অপচয়। শস্য ও খাদ্যের অপচয় নানাভাবে নানা পর্যায়ে হচ্ছে। উৎপাদক থেকে ভোক্তার কাছে পৌঁছাতে নষ্ট হচ্ছে, যাকে পোস্ট হারভেস্ট লস বা ফসলোত্তর ক্ষতি বলা হয়। আর ফসলোত্তর ক্ষতির কারণে দেশের মোট শস্যের বড় একটি অংশ নষ্ট হচ্ছে। আর দেশের অর্থ ও সম্পদের অপচয়ও হচ্ছে। খাদ্যশস্যের এ ধরনের অপচয় খাদ্য নিরাপত্তার জন্য যেমন হুমকি, তেমনি খাদ্য অধিকারকেও বঞ্চিত করছে। সার্বিকভাবে পুষ্টি নিরাপত্তাকে করছে বাধাগ্রস্থ। পুষ্টিহীনতার এ পরিস্থিতি

দেশের অর্থনীতির ওপর ক্ষত সৃষ্টি করছে। গবেষণায় দেখা গেছে, পুষ্টিহীনতায় বছরে ক্ষতি হচ্ছে জিডিপির ৮ শতাংশ। সে হিসাবে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রায় ১৯ লাখ ৫৬ হাজার কোটি টাকার জিডিপি অর্জন হয়েছিল। ফলে তার ৮ শতাংশ যদি কম অর্জন হয়, তাহলে তার পরিমাণ হবে ১ লাখ ৫৬ হাজার কোটি টাকার বেশি। ক্ষতির অন্যতম কারণ, অপুষ্টি নিয়ে বড় হওয়া একজন মানুষ স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে ৫০ শতাংশ কম মজুরি পেয়ে থাকে। অপুষ্টির কারণে সমাজে নানা ধরনের অর্থনৈতিক বৈষম্য তৈরির কারণে পিছিয়ে পড়ছে। আবার স্বাস্থ্য ব্যয়ও বেশি থাকে। এজন্য বর্তমানে সারা বিশ্বেই খাদ্য, পুষ্টি নিরাপত্তার পাশাপাশি খাদ্য অধিকারের বিষয়টি জোর দেয়া হচ্ছে। এমনিতেই দেশে পুষ্টি ও খাদ্যহীনতায় থাকে প্রায় ৩ কোটি ৭৬ লাখ মানুষ। এসব মানুষের খাদ্য অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব না হলে আগামী দিনের উন্নত বাংলাদেশের যে স্বপ্ন দেখা হচ্ছে, তা বাস্তবায়ন অনেকটাই দুরূহ হবে।

খাদ্যশস্য উৎপাদন ও ফসলোত্তর ক্ষতি

দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং খাদ্যশস্যের সহজলভ্যতা একটি পর্যায়ে এসেছে। কিন্তু নীতি এবং কর্মসূচির যথাযথ বাস্ড়বায়নের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বাংলাদেশে কয়েকটি প্রধান কৃষিপণ্যের (ধান, গম, ভুট্টা, আলু, পেঁয়াজ, ফল ও সবজি) উৎপাদন হচ্ছে ছয় লাখ টনের নিচে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এ সাতটি শ্রেণীর ফসলের উৎপাদন ছিল ৫ কোটি ৮৪ লাখ টন। এর মধ্যে চাল ৩ কোটি ৫৭ লাখ, গম ১৩ লাখ, আলু ৯৫ লাখ, ভুট্টা সাড়ে ২৪ লাখ, পেঁয়াজ ১৭ লাখ ৩৫ হাজার, ফল ৪৮ লাখ ১০ হাজার এবং সবজি ৩৮ লাখ ৭৭ হাজার টন। তবে কৃষিপণ্যের এ উৎপাদনগুলো দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় ভূমিকা রাখলেও ফসলোত্তর ক্ষতি শঙ্কা বাড়াচ্ছে।

গবেষণায় দেখা গেছে, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রায় ৮৩ লাখ টন শস্য নষ্ট হয়েছে, যা মোট উৎপাদিত শস্যের প্রায় ১৪ শতাংশ। নষ্ট হওয়া এসব শস্যের বাজারমূল্য প্রায় ৩২ হাজার কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের প্রায় ১০ শতাংশ এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির প্রায় ৩২ শতাংশ। খাদ্যশস্যের এ ধরনের অপচয় খাদ্য নিরাপত্তার জন্য যেমন হুমকি, তেমনি খাদ্য অধিকারকেও বঞ্চিত করছে। সার্বিকভাবে পুষ্টি নিরাপত্তাকে করছে বাধাগ্রস্ড়। আর দেশের অর্থ ও সম্পদের অপচয়ও হচ্ছে। আর দেশের দরিদ্রতা থেকে মানুষকে উন্নতির যে পরিকল্পনা রয়েছে সেটিও বাধাগ্রস্থ করছে।

খাদ্যের অপচয় নানাভাবে নানা পর্যায়ে হচ্ছে। তবে আমরা গবেষণায় শুধু উৎপাদক থেকে ভোক্তার কাছে পৌছাতে যেসব প্রক্রিয়ায় ক্ষতি হচ্ছে, সেটির একটি চূড়ান্ড় হিসাব করেছি। যাকে পোস্ট হারভেস্ট লস বা ফসলোত্তর ক্ষতি বলা হয়ে থাকে। সেখানে শস্য, সবজি, ফল ও মাছের অপচয়কে হিসাবে নেয়া হয়েছে। হরটেক্স ফাউন্ডেশনের 'প্যাকেজিং অ্যান্ড ট্রান্সপোর্টেশন প্রবলেম অ্যান্ড অপরচুনিটিস ইন হর্টিকালচার সাপ্লাই চেইন' শীর্ষক এক গবেষণায় দেশের সবচেয়ে বেশি উৎপাদিত ফল ও সবজির ওপর পোস্ট হারভেস্ট লসের পরিমাণ দেখিয়েছে। এ গবেষণায় যেসব ফল ও সবজি অন্ড়র্ভুক্ত রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে উলেণ্ডখযোগ্য হলো– আম, আনারস, কলা, পেঁপে, কাগজি লেবু, শিম, গাজর। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের সবজির মধ্যে রয়েছে– বাঁধাকপি, লাউ, কুমড়া, টমেটো, ওকরা, বেগুন, মরিচ ও আলু। এসব ফসলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হচ্ছে আলুর। এর পরই রয়েছে– কলা, আম, মরিচ ও টমেটো।

সবজি এবং ফল মূলের প্রায় ১৫-২৫ শতাংশের বেশি ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে উৎপাদক, সংগ্রহকারী, পাইকার এবং খুচরা ব্যবসায়ির হাত বদলে। সবচেয়ে কম নষ্ট হচ্ছে উৎপাদক পর্যায়ে। সব ধরনের সবজি এবং ফলমূলের মাত্র ৩ দশমিক ৩ শতাংশ নষ্ট হচ্ছে তাদের নিকট। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের সংগ্রহকারীদের নিকট এসব ফসলের ক্ষতির পরিমান ৬ দশমিক ৩ শতাংশ। তবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হচ্ছে পাইকারী বিভিন্ন ব্যবসায়ির নিকট। বিভিন্ন পর্যায়ের পাইকারী ব্যবসায়িদের কাছে ফল এবং সবজির নষ্টের পরিমান ১১ দমমিক ৬ শতাংশ। এছাড়া খুচরা ব্যবসায়িদের কাছে ফসলের নষ্ট হচ্ছে ৫ দশমিক ১ শতাংশ। খাদ্য অপচয়ের সঙ্গে খাদ্য অধিকার একটি সম্পর্ক রয়েছে। যে খাদ্য উৎপাদনের পর ভোক্তার কাছে পৌছাতে পারলো না সেটি অপচয়ের পাশাপাশি অধিকারকেও বঞ্চিত করলো।

ফসলোত্তর ক্ষতির কারন

ফার্ম পর্যায়ে: ব্রেকিং, স্কেটারিং, ইকসেস্ট ইনফেকশন, প্রযুক্তির অভাব, শুকানোর সক্ষমতার অভাব।
বিপণন পর্যায়ে: সীমিত গুদামজাতকরন, দূর্বল পরিবহনজাতকরন এবং প্যাকেজিং এর অভাব

ফসলোত্তর ক্ষতির প্রক্রিয়া

উৎপাদন-কারভেস্ট লস- থ্রেসিং লস- ড্রাইং লস- প্রোসেসিং লস- গ্রেডিং এ্যান্ড ট্রিমিং লস- ট্রান্সপোর্টেশন লস- স্টোরেজ লস- ডিসট্রিবিউশন লস-কনসামশন লস- চুড়ান্ড় ভোগ

কোন কৃষি পণ্যে কি ধরনের ক্ষতি

চাল: প্রতি বছর প্রায় সাড়ে তিন কোটি টন চাল উৎপাদন হচ্ছে যার ১২-১৩ শতাংশই নষ্ট হচ্ছে। ফলে প্রতি বছর প্রায় ৪৫ লাখ টন চাল নষ্ট হচ্ছে। উৎপাদক ও ভোক্তা এ চালটি পাচ্ছে না। গড়ে প্রতি কেজি চালের দাম ৪০ টাকা হিসেবে প্রায় ১৮ হাজার কোটি টাকা।

চালে কোথায় কিভাবে অপচয়: সঠিক আদ্রতায় ধান কেটে ভাঙ্গানো হলেও প্রতি মনে ২৭-২৮ কেজির বেশি চাল পাওয়া সম্ভব। কিন্তু দেশের অধিকাংশ ধানই সঠিক আদ্রতায় কাটা হচ্ছে না। ফলে প্রতি মন ধান থেকে ২৫-২৬ কেজির বেশি চাল পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এ অবস্থায় আদ্রতাজনিত অজ্ঞতার কারনে প্রতি মন ধানে আমরা ২-৩ কেজি চাল কম পাচ্ছি। আদ্রতাজনিত অজ্ঞতা ছাড়াও

দুর্বলতা রয়েছে ধান ভাঙ্গানোর পদ্ধতিতে। দেশে গত অর্থ বছরে ধান উৎপাদন হয়েছে প্রায় পাঁচ কোটি টন। রাবার হালার প্রযুক্তির প্রসার না হওয়ায় এখনো প্রথাগত কলেই (হাস্কিং) চাল উৎপাদন হচ্ছে। এতে গড়ে দেড় শতাংশ চাল কম পাওয়া যাচ্ছে। বর্তমানে প্রথাগত চালকলের মাধ্যমে ভাঙ্গানো হচ্ছে মোট ধানের ৭০ শতাংশ বা সাড়ে তিন কোটি টন। দেড় শতাংশ হিসেবে এক বছরেই নষ্ট ধানের পরিমান প্রায় ৫ লাখ ২৫ হাজার টন যা চালে পরিণত করলে হয় প্রায় সাড়ে তিন লাখ টন। প্রথাগত পদ্ধতির কারণে চালের অপচয়ের চিত্র উঠে এসেছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) সাম্প্রতিক এক গবেষণায়। আবার ধান থেকে চাল উৎপাদন এবং তা ভোক্তা পর্যায়ে পৌঁছায় পাঁচ ধরনের মধ্যস্বত্তভোগীর হাত ঘুরে আসে। এখানেও নষ্ট হচ্ছে হচ্ছে চাল। আবার উৎপাদন পর্যায়ে রয়েছে কৃষকের অজ্ঞতা।

ফল: দেশে প্রায় ৭০ প্রজাতির ফল উৎপাদন হচ্ছে। বিভিন্ন প্রজাতির এসব ফলের ১২ থেকে ২৫ শতাংশ পর্যন্ড় নষ্ট হচ্ছে। গবেষনায় দেখা গেছে গড়ে ১৭ শতাংশ ফল নষ্ট হচ্ছে। গত অর্থ বছরে ৪৮ লাখ ১০ হাজার টন ফল উৎপাদন হয়েছে।নষ্ট হচ্ছে প্রায় ৮ লাখ ১৮ হাজার টন। প্রতি কেজি ফলের গড় দাম ১০০ টাকা করে ধরলেও প্রায় ৮ হাজার ২০০ কোটি টাকা।

সবজি: দেশে প্রায় ১৩০ প্রজাতির সবজি উৎপাদন হয়। এসব সবজির মধ্যে ৪৫ টি প্রজাতির সবজি বেশি আবাদ হয়। গড়ে প্রতি বছর প্রায় ৪৯ লাখ টন সবজি উৎপাদন হচ্ছে। বিভিন্ন প্রজাতির এসব সবিজির প্রায় ১৫-৩০ শতাংশ পর্যন্ড় নষ্ট হচ্ছে। গড়ে প্রায় ২০ শতাংশ সবজি নষ্ট হচ্ছে। যা পরিমানে প্রায় ১০ লাখ টন। প্রতি কেজি সবজির দাম ৩০ টাকা হিসেবে ধরলে প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকা।

আলু: **গত** অর্থ বছরে প্রায় ১ কোটি ৫ লাখ টন আলু উৎপাদন হয়েছে। পর্যাপ্ত গুদাম এবং সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নত না থাকায় প্রায় ২০ লাখ টন আলু নষ্ট হয়েছে। প্রতি কেজি ১৫ টাকা হিসেবে ধরলে বাজার মূল্য দাড়ায় প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকা।

মাছ: উৎপাদিত মাছের ২২-২৫ শতাংশই অপচয় হচ্ছে। দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে মৎস্য খাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও অবহেলা ও অব্যস্থাপনায় অপচয় হচ্ছে উৎপাদিত মাছের ২৫ শতাংশ। বছরে প্রায় ১০ লাখ টন মাছ থেকে বঞ্চিত বাংলাদেশ। পচনশীল দ্রব্য উৎপাদক থেকে ভোক্তা পর্যায়ের আসার আগ পর্যন্ত বিভিন্ন কারনে বিভিন্ন মাত্রায় এসব মাছ নষ্ট বা অপচয় হচ্ছে। অপচয়ের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন প্রজাতির এবং আকারের পার্থক্য রয়েছে। এছাড়া মাছ নষ্ট হবার পেছনে সবচেয়ে বেশি দায়ি রয়েছে পরিবহন এবং সংরক্ষনে অদক্ষতা। সঠিক মাত্রায় পরিবহন এবং সংরক্ষণ করতে না পাবার কারনে ১৫-১৭ শতাংশ মাছ নষ্ট হচ্ছে। এছাড়া খুচরা ও পাইকারী বাজারের বিক্রেতাদের অদক্ষতার কারনেও মাছ নষ্ট হচ্ছে। আবার ভোক্তা পর্যায়ে মাছটি আনার পর মাছের উচ্ছিষ্টাংশ ফেলে দিচ্ছেন ভোক্তারা। এখানেও বাদ চলে যায় মাছের ২-৫ শতাংশ।

ফসলোত্তর ক্ষতির প্রভাব

খাদ্যের অপচয়: শস্য, সবজি ও ফল উৎপাদনের পর তা সংগ্রহকারী ও পাইকারী ব্যবাসায়ি হয়ে খুচরা বিক্রেতার কাছ থেকে ভোক্তার কাছে পৌছাতে নষ্ট হচ্ছে। উপযুক্ত পরিবহন ব্যবস্থা না থাকা, দূর্বল প্যাকেজিং ব্যবস্থার সঙ্গে জনসচেতনতার অভাবই এর বড় কারন। দেশের এই ক্ষতি কমাতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে প্রযুক্তি ও প্যাকেজিং শিল্প উন্নত করা। পাশাপাশি দেশে পর্যাপ্ত শস্য গুদাম না থাকার কারনে কৃষকরা সেগুলোকে মজুদ রাখতে পারে না। ফলে বাজারে চাহিদা না থাকলেও কম দামে বিক্রি করতে হয় নতুবা রাস্তায় ফেলে দিতে হচ্ছে। উন্নত বিশ্বের মাছের উচ্ছিষ্টাংশ থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও খাদ্য পণ্য উৎপাদন হলেও বাংলাদেশে তার কোন সুযোগ নেই। অথচ গবেষণা বলছে শুধুমাত্র এ ধরনের উচ্ছিষ্টাংশ দিয়ে তেল, অয়েল কেক ও খাবার তৈরি এবং শিল্প উৎপাদনের কাঁচামাল তৈরি করে বছরে ৮-১০ হাজার কোটি টাকা আয় করা সম্ভব।

অর্থনৈতিক ক্ষতি: দেশে উৎপাদিত শস্যের বিরাট একটি অংশ নষ্ট হচ্ছে ফসলউত্তোর ক্ষতির কারনে। ফলে দেশ অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতির শিকার হচ্ছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রায় ৮৩ লাখ টন শস্যের যে ৩২ হাজার ২০০ কোটি টাকা ক্ষতির শিকার হয। পাশাপাশি এ বিপুল পরিমান শস্য উৎপাদন করতে কৃষি উপকরন বিশেষ করে সার, কীটনাশক এবং শ্রম যুক্ত হয়। পাশাপাশি এ ফসলগুলো নষ্ট না হলে অন্য শস্য আবাদের সুযোগ নষ্ট করে। সবমিলিয়ে ৩৫ হাজার কোটি টাকার অর্থনৈতিক ক্ষতির শিকার হচ্ছে বাংলাদেশ।

দাম বৃদ্ধি পায়: **যে** শস্য ও খাদ্যগুলো নষ্ট হচ্ছে সেখান থেকে বাজারে সরবরাহকৃত অংশের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। ফলে বিপননের জন্য পণ্য কমে যাচ্চে। এতে করে বাজারে পণ্যের দাম বৃদ্ধি করছে।

খাদ্য ও স্বাস্থ্য নিরাপত্তায় হুমকি: বাজারে নষ্ট হওয়া পণ্যগুলো সরবরাহ করা হলে মানুষের খাদ্য প্রাপ্তি আরো সহজ হতো। কিন্তু অপচয়ের কারনে সেটি সম্ভব হচ্ছে না। এতে খাদ্য নিরাপত্তার বিঘ্নিত হবার পাশাপাশি স্বাস্থ্য নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করছে।

দারিদ্রতা বৃদ্ধি ও সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার: **তবে** অপচয়ের কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার হচ্ছেন দরিদ্র অঞ্চলের মানুষহুলো। গবেষণায় দেখা গেছে, দেশের মানুষের পুষ্টি চাহিদার ৭১ শতাংশই আসছে চাল থেকে। এছাড়া এ পন্যটির মাধ্যমে ৫৪ শতাংশ মানুষের প্রোটিন এবং ১৫ শতাংশ জিঙ্কের চাহিদা পুরন করা হচ্ছে। আবার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ৭৮ শতাংশ ক্যালরি আসে ভাত থেকে, আবার ৫৭ শতাংশ প্রোটিন, ৬২ শতাংশ জিঙ্ক এবং ৪৫ শতাংশ আইরনের যোগান দিচ্ছে চাল। ফলে অপচয় হলে দরিদ্র মানুষের পুষ্টি নিরাপত্তা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

দরিদ্রপ্রবণ এলাকার মানুষ বেশি ক্ষতির শিকার: **পরিসংখ্যান** বিশেণ্ডষণ করে দেখা গেছে, দরিদ্রপ্রবণ জেলাগুলোতে চাল, ফল ও সবজির উৎপাদন সবচেয়ে বেশি। ফলে এসব জেলায় অপচয়ের কারনে উৎপাদন কমে যাওয়ার অর্থ হলো তারাও বঞ্চিত হচ্ছে। যা বৈষম্য তৈরি করছে।

খাদ্যের অপচয় রোধ এবং খাদ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় 'খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ'-এর সুপারিশ

- অপচয় রোধে সচেতনতা বাড়াতে সম্প্রসারণ কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং গুদাম ও মজুদ ব্যবস্থা জোরদার করতে পর্যাপ্ত শস্য গুদাম নির্মাণ করে হবে ;
- চালের অপচয় রোধে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের মতো প্রথাগত এঙ্গেলবার্গ পদ্ধতিতে উৎপাদন নিষিদ্ধ করা যাতে ফসলের অপচয় রোধের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে;
- বিশ্বের প্রায় সব দেশে ময়েশ্চার মিটার মেশিন দিয়ে আদ্রতা পরিমাপ করে ধান কাটার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু দেশের মানুষ এখনও ধান কাটার আগে দাতে কামড় দিয়ে কিংবা চোখের দৃশ্যমান অভিজ্ঞতার আলোকে সিদ্ধান্ত নেয়। যেটি একটি অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। আদ্রতা পরিমাপের জন্য মেশিন সরবরাহ করলে বড় ধরনের অপচয় থেকে রক্ষা করা সম্ভব;
- জমির উর্বরাশক্তি ধরে রাখা এর বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে আরো উৎপাদন বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে। সেক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমিয়ে আনা, কৃষি খাতে উন্নত প্রযুক্তি ও উপকরণের ব্যবহার ও ঘাতসহিষ্ণু (তাপ, লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা, খরা) জাতের ব্যবহার বাড়াতে হবে;
- গণমাধ্যমে অপচয় রোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং কার্যকর নতুন প্রযুক্তি সঠিক সময়ে সংশ্লিষ্টদের (সম্প্রসারণ কর্মী, বেসরকারী উদ্যোক্তা, বিপণন কর্মীর) কাছে পৌঁছানো;
- অবিলম্বে সরকারী উদ্যোগে খাদ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করতে হবে। যেখানে খাদ্যকে অধিকার হিসেবে স্বীকৃতির পাশাপাশি ফসল উত্তোর ক্ষতিগুলোকে কমিয়ে আনতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ থাকতে হবে।

সাহানোয়ার সাইদ শাহীন
সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ কৃষি সাংবাদিক ফোরাম